নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে স্বাধীনতার পদধ্বনি

ডঃ দিপালী মণ্ডল এ্যাসিসটেন্ট প্রফেস
বাংলা বিভাগ
সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন

বাংলা সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর্বিভাব ৫০শের দশকে। তাঁর আর্বিভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ঘটে গেছে এক বিশাল পরিবর্তন ১৯০৫-৫০ এই সময় কালে ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়ে এক বিশাল ঝড় বয়ে গেছে, যেমন ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ১৯১৪ তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯২০ তে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০শে আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৩৯ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪১ এ আগস্ট আন্দোলন, ৫০শের মন্বন্তর, দেশবিভাগ, রক্তরঞ্জিত স্বাধীনতা-১৯৪৭- এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ, বাঙালী সমাজ ও বাঙালী জীবনে ঘটল এক বিশাল রুপান্তর। শরৎচন্দ্রের রোমান্টিকতা, কল্লোলগোষ্ঠীর বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা রবীন্দ্রনাথের অটল বিশ্বাস সব কিছু ধুলিস্মাৎ হয়ে গেছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাহিত্য রচনা করতে এগিয়ে এলেন একদল তরুন লেখক - তারা হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, সন্তোষ কুমার ঘোষ প্রমুখরা।

ইতিপূর্বে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা কথা সাহিত্য এগিয়ে গেছে অনেকদূরে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া ভালো যে, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সেই সময়ে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তারই সাযুজ্যে বিভূতিভূষন, তারাশংকর ও মানিকের লেখা উপন্যাস বৈচিত্রগামী হলেও রাজনৈতিক প্রচ্ছায়া থেকে তা কিন্তু সরে আসতে পারেনি। সেই সময় একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া, অন্যদিকে শহর থেকে দূরে গ্রাম-গ্রামান্তরে জাতীয়তা বোধ সর্ম্পকে সাধারন মানুষকে সচেতন করাই ছিল শিল্পী সাহিত্যিকদের কাজ। দেশ মাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য সেই সময় কলম ধরতে এগিয়ে এসেছিলেন যে সকল সাহিত্যিকেরা তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি গান্ধীবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তার মেজদা শেখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সশস্ত্র বিপ্লবে অংশগ্রহন করে কারাবরন করেন। তাঁর পিতা সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দেন। তাই আমরা বলতে পারি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাল্যকাল থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ সর্ম্পকে অবহিত ছিলেন। তিনি জন্মে ছিলেন ফরিদপুর জেলার বাসুদেবপুর গ্রামে ১৯১৮ খ্রীঃ। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে উত্তরবঙ্গে। তাই তাঁর গল্প উপন্যাসে উত্তরবঙ্গ বার বার ফিরে এসেছে। পরবর্তীকালে চাকুরীসূত্রে তিনি কোলকাতায় আসেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রায় ৫৪টি উপন্যাস রচনা করেছেন। এর মধ্যে স্বাধীনতার প্রস্তুতিপর্ব দেখানো হয়েছে যে সকল উপন্যাসে তার মধ্যে তিনটি উপন্যাস আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয়। যেমন তিমিরতীর্থ, মন্দ্রমুখর এবং বৈতালিক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনৈতিক সংকটকে পুঙ্খানুপঙ্খ ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। বিপ্লববাদকে তিনি সমর্থন করেছেন - উদ্দেশ্য একটিই স্বাধীনতা প্রাপ্তি। তার উপন্যাসের পাতায় পাতায় স্বাধীনতার পদধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে। আমি আমার আলোচনায় নিবিড় বিশ্লেষনের মাধ্যমে দেখাতে চেষ্টা করবো সাধারন মানুষ কিভাবে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা পেতে সচেষ্ট হয়েছিল।

তিমিরতীর্থ (১৩৫১ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসটি ছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম রচনা। এই উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট ছিল পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার বাসুদেবপুর গ্রাম। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূণ পর্বটি এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই পর্বটি হল একদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংসা অসহযোগ আন্দোলন, অন্যদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় উত্তাল বঙ্গভূমি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাল, বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজ, অসহযোগ ও সন্ত্রাস বাদী আন্দোলন, তরুন সমাজের রাজনীতি চর্চা সবকিছুই নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে এই উপন্যাসে।

এমনি এক দুর্বার সময়ে এই উপন্যাসের নায়ক প্রফুল্ল সেনগুপ্ত পেশায় যিনি শিক্ষক, বাস্তবিক ক্ষেত্রে ছদ্মবেশী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন সৈনিক। তিনি বাসুদেবপুর গ্রামে উপস্থিত হয়েছেন। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তিমিরান্ধকার দূর করে ওই গ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করা। বরিশাল জেলার পাশাপাশি

পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলার গ্রামীন সমাজের নিটোল চিত্র ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে।
এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামের সকল স্তরের মানুষের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। চরিত্রাঙ্কনে সুদক্ষ শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রফুল্লকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তার অভীষ্ট লক্ষ্যে। শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, বিচারে তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে বহুযোজন দুরে আন্দামানে। প্রফুল্লর উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামকে শহরতলীর সীমানা ছাড়িয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে পৌঁছে দেওয়া। এই উপন্যাসটির সাযুজ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোট বকুল পুরের যাত্রী' গল্পটির কথা বলা যেতে পারে।

এখানে ঔপন্যাসিক স্বল্প কথায় স্কুলের শিক্ষক রুপে প্রফুল্ল সেনগুপ্তের স্বদেশী কাজকর্মের পরিচয় দিয়েছেন-

''প্রফুল্ল প্রস্তাব করিল, 'ইস্কুলের মাথায় একটা জাতীয় পতাকা বসাইয়া দেওয়া হউক।

ইস্কুল কমিটির ঘরোয়া মিটিং। ভিড় খুব বেশী না থাকিলেও সামান্য যে কয়জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন, তাহারাই এমন হল্লা বাঁধাইয়া বসিলেন যে বলিবার নয়। ব্রিটিশ রাজত্বে বাস করিয়া এমন একটা দুঃসাহসিক প্রস্তাব যে কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, এটা তাঁহাদের কল্পনার বাইরে।''(তিমির তীর্থ - না: গ: রচনাবলী (২ম খন্ড) পৃ- ৫২৬)

''আমাদের হেডমাস্টার মশাই বিজ্ঞ লোক, এই-কদিনেই ইস্কুলটার চমৎকার উন্নতি করেছেন। কিন্তু তার মুখ দিয়ে যে এমন একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বেরোবে, এ আমরা কিছুতেই আশা করিনা।''(পৃ- ৫২৬)

আবার অন্য জায়গায় দেখা যায় সরকারী নিষেধ অমান্য করে স্কুলের মাঠে মিটিংয়ের আয়োজন করেছিল প্রফুল্ল ও তার সঙ্গী সাথীরা-

'মিটিং হচ্ছে স্কুলের মাঠে, চলুন - রামকমল পুলিশবাহিনীকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন।

প্রফুল্ল ডায়াসে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথায় তাহার খদ্দরের টুপি, তাহার দীর্ঘ দেহ স্থির সংকল্প দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার চোখের সেই দীপ্তি আরো উজ্জ্বল দেখাইতেছে।
জনতা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিল।
ঠিক এমনি সময়েই ইনসপেক্টর তাহার পুলিশবাহিনী লইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন।'পৃ-৮৭
'সাহেবপুর ঘাট হইতে স্টীমার ছাড়িল। একদা প্রফুল্ল এখানে আসিয়া নামিয়া ছিল, আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে এখান হইতে বিদায় লইল। তবে এবারে সে আর শুধু একা নয়, সঙ্গী অনেকেই। পুলিশের সতর্ক পাহারা। তাহাদের সদরে লইয়া যাওয়া হইতেছে।'(পৃ-৯০)

মন্দ্রমুখর : উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে। 'মন্দ্রমুখর' উপন্যাসের ভূমিকায় বিমলচন্দ্র ঘোষ বলেছেন-

'আসে রাত্রি মহাবিপ্লবের
মশাল জ্বালায়ে রাখো ঘরে ঘরে দৃপ্ত জীবনের।'

মন্দ্রমুখর - না: গ: রচনাবলী (২য় খন্ড) পৃ- ৮৫

এই অভিমতের মধ্যে উপন্যাসের বিষয়বস্তু উচ্চকিত হয়ে ওঠে।

এই উপন্যাসটি লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর মেজদা স্বাধীনতা সংগ্রামী শেখর নাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করে লিখেছেন - 'নির্যাতন আর কারাবাস যার বিদ্রোহী প্রাণ অবদমিত করতে পারেনি, সেই অক্লান্ত দেশকর্মী মেজদাকে।'(পৃ-৮৬)

ভূমিকায় বিমলচন্দ্র ঘোষের অভিমত এবং উৎসর্গ পত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য দুটিকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। 'মন্দ্রমুখর' উপন্যাসের পটভূমি উত্তরবঙ্গের একটি ছোট শহর। এই শহরটির নাম নিশ্চিন্তনগর। এই আর্ধ ঘুমন্ত শহরে একদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের বন্যা এসে পৌঁছায়। শহরের নিস্তরঙ্গ জীবন হয়ে উঠল উত্তাল। ভারতছাড়ো আন্দোলনে রাজভক্ত সরকারী অফিসারের পুত্র থেকে শুরু করে নীচু জাতি 'বাহে' সম্প্রদায়ের দেহাতি মানুষ

দরিদ্র রাজবংশী সবাই যোগ দেয়। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দু-একটি ঘটনাও লক্ষ্য করা যায়। 'মন্দ্রমুখর' উপন্যাসটি এই অর্ধনিদ্রিত শহরের অর্ধনিদ্রিত মানব সমাজের নব-জাগরনের কাহিনী। এছাড়া উপন্যাসটি স্বাধীনতা সংগ্রামে কারো কারো আত্মাহুতির কাহিনীও বটে।

ছোট্ট শহর নিশ্চিন্তনগর হয়ে উঠেছে দুর্বার স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবর্ষের প্রতীক। পূরবী, অনিমা, সন্ধ্যার মহিলা সমিতি গঠন, ১৯৪২ এ ভারতছাড়ো আন্দোলনে সর্বসাধারনের অংশগ্রহনের বিষয়টিকেই দিয়েছে প্রাধান্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে ছিলেন উত্তরবঙ্গের মানুষ, উত্তরবঙ্গের পথঘাট, জনজীবনের চিত্রটি ছিল তাঁর নখদর্পণে। তাই তিনি নিপুণ ভাবে অসম সন্নিহিত বাংলাদেশের (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ) কোচবিহার জেলার একটি মহকুমা শহরকে কেন্দ্রস্থলে রেখে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সংগঠিত 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনের উত্তাপকে সঞ্চারিত করেছেন। এই আন্দোলনে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ন। তাই এই উপন্যাসটিতে শিক্ষক, আইনজীবি, ডাক্তার, সাধারন নরনারী এমনকি শ্রমজীবি মানুষ সকলেই যে এগিয়ে এসেছেন তা উপন্যাসটি পড়ে আমরা বুঝতে পারি। ইংরেজ মাতা, বঙ্গভাষী পিতার একমাত্র কন্যা এডিথ রেখা সান্যাল এই উপন্যাসের একটি স্মরনীয় চরিত্র। সে পেশায় ডাক্তার এবং নিশ্চিন্তপুর হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। যাকে নিয়ে তার ঘর বাঁধার স্বপ্ন ছিল, সেই প্রভাস স্বাধীনতা আন্দোলনের অহিংস বিপ্লবী। ভারতছাড়ো আন্দোলনের পর ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিতটি গিয়েছিল নড়ে। তারই ফলশ্রুতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি। উপন্যাসের শেষে সেই রক্তারুন দিনটির সম্ভাব্য রুপটিকে প্রতিফলিত করেই উপন্যাসের সমাপ্তি।

বৈতালিক : বৈতালিক (১৩৫৪) উপন্যাসটি বিদেশী শাসন-শোষনের বিরুদ্ধে বাঙ্ময় আন্দোলনের কাহিনী। উপন্যাসটি সংসার পরিজন ছাড়া বিপ্লবীদের আত্মবলিদানের দলিল। উপন্যাসের নায়ক ছদ্মবেশী ফেরারী রাজনৈতিক আসামী। নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি অঞ্চলের মানুষের জীবন কাহিনী এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বৈতালিক উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উত্তরবঙ্গের কথ্য ভাষার ব্যবহার। এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা খুবই কষ্টকর, এখানে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। এখানকার মানুষদের **প্রতিনিধিরা** হলেন- শ্রী মহিন্দার রুইদাস, হারান, সুরেন, যোগেন, বাসু এবং ভূষন রুইদাস। এদের মধ্যে দু-একজন নাম সই করতে পারেন। এই গ্রামকে স্বাধীনতার আলো দেখাবার জন্য আসলেন অতুল মজুমদার নামে এক ছদ্মবেশী স্বাধীনতা সংগ্রামী। পরামানিক পরিচয় নিয়ে শিক্ষকের ছদ্মবেশে সে আশ্রয় নিয়েছিল 'ব্রাত্য' সমাজের এই গ্রামে। তাদের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী ও নবচেতনার আস্বাদ ছড়িয়ে দেবে এই ছিল তার ব্রত। সে এই গ্রামেরই স্কুলের ট্রেনিং পাশ মাস্টার মশাই। তিনি গ্রামে এসে নিরক্ষর মানুষদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেন। তারই চেষ্টায় গ্রামবাসীদের কেউ কেউ নাম সই করতে পারে, যেমন মহিন্দার রুইদাস। হারান, যোগেন ও সুরেশ এরা তিনভাই। ছোট ভাই যোগেন পড়াশোনা জানে, শহরের যাত্রাদলে গান গায়। একটি যাত্রার আসরে বংশী মাস্টারের সাথে পরিচয় হয়েছিল যোগেনের। বংশী মাস্টার তার গান শুনে তাকে স্বদেশী গান রচনা করতে বলেন। এই গান যোগেন গ্রামে গ্রামে শোনাবে আর গ্রামবাসীদের স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। বংশী মাস্টার বিভিন্ন চারণ কবিদের অবদানের কথা যোগেনকে স্মরন করিয়ে দেন। এতে যোগেন উৎসাহ পায় এবং স্বদেশী গান রচনা করে।

বংশী মাস্টার যোগেনকে কিভাবে উৎসাহিত করেছেন তার প্রমান পাওয়া যায় এখানে-

''কাজ করতে হবে অনেক বড়, অনেক কঠিন কাজ। জমিদারের অত্যাচার, মহাজনদের অন্যায়। ব্রাহ্মনেরা তাদের ছুঁতে চায় না, মুচির পূজোয় পৌরোহিত্য করতে রাজী হয় না তারা। প্রতিকার চাই এর, প্রতিবিধান চাই। কথা দিয়ে যা বলা যায় না তাকে গান দিয়ে বলতে হবে, কানের কাছে যা শুধু ব্যর্থ আঘাত দিয়ে যায়, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে মনের ভেতরে - সঞ্চারিত করে দিতে হবে বুকের রক্তধারায়। চারণেরা পথে পথে বীণা বাজিয়ে বেড়ায়, ডাক দেয় মানুষকে, জাগিয়ে তোলে, তাদের হাতে এগিয়ে দেয় খোলা তলোয়ার। যোগেন কি হতে পারে না তাদের মতো?''বৈতালিক - (না: গ: রচনাবলী (১ম খন্ড) পৃ- ৪৩৩)

মাস্টারের নির্দেশমতো এই গানটা লিখেছিল যোগেন :

'' হায় হায় দেশের একি হাল
যারা ক্ষেতে যোগায় ফসল,
তার ঘরতই নাইরে চাল।
মুখের গরাস লিলে কাড়ি,
লিলে জমি, লিলে বাড়ি,
বড়লোকের জুলুম বাজি
সহিমু আর কত কাল
হায়রে কহ, দেশের ইটা কেমন হাল।''(পৃ-৪০০-৪৩৪)

যোগেনের স্বদেশী গান শুনে গ্রামের জমিদার ও মহাজনেরা থানার দারোগা বাবুর কাছে নালিশ করেন। এছাড়া বংশী মাস্টারের কাজকর্ম দেখে তাদের সন্দেহ হয়েছিল, গ্রামের লোকেরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। ব্রাত্যশ্রেনীর লোকেরা স্কুলের মাঠে সরস্বতী পূজার আয়োজন করেছিল, আর এই মাঠে গান গাইবে যোগেন - এ খবর পুলিশের কাছে পৌছলে পুলিশ বংশী মাস্টারকে ধরতে যায়। কিন্তু তিনি আগেই পালিয়ে যান।

পুলিশের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে যোগেনের ওপর। যোগেন এবং তার সহপাঠীদের পুলিশ মারধর করে তাদের যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে দেয়। গানের আসর থেকে সবাই চলে গেলে হারান আবার নতুন করে ঢাক বাজাবার কাজে মন দেয়। এইখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি।

এই উপন্যাসের বর্নিত কাহিনী নেওয়া হয়েছে বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে, যখন বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে আর তারই উত্তাপে দেখা দিয়েছে গন আন্দোলন- সেই গন আন্দোলনের পূর্বাভাস প্রবাহিত স্বাধীনতা আন্দোলনের আপাত সমাপ্তি। এই অধ্যায়টিকে ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের কাহিনীর বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। যোগেন হয়ে উঠেছে লোক শিল্পী থেকে গনশিল্পীতে। সে হয়ে ওঠে গন আন্দোলনের অগ্রদূত। তাকে কেন্দ্র করে বংশী মাস্টারের ওরফে অতুল মজুমদারের ভাব-ভাবনা, মতাদর্শ সবকিছুর প্রকাশ ঘটে। সে ছড়িয়ে দেয় শোষণ - বঞ্চনা, অবিচার-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রতিবাদের বানী, মুক্তির বানী।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর ব্রহ্ম মন্দির থেকে আশ্রম প্রদক্ষিনে যে প্রভাতী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন সেই অনুষ্ঠান আজও প্রবহমান। সেই অনুষ্ঠানের নাম বৈতালিক। আলোচ্য উপন্যাসের নামকরণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, তবে তার উদ্দেশ্য প্রবাহিত হয়েছে স্বতন্ত্র পথে। সুর মূর্ছনায় সমবেত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অধ্যাত্ম চিন্তায় ডুব দিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চেয়েছেন ঐ বৈতালিকদের সমবেত সঙ্গীতের মতই গনজীবনে জনগনের সুখ, দুঃখ, অত্যাচার, অবিচার, শোষণের স্বরূপটি সমবেত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সকলের কাছে পৌছে দিতে। তাইতো নামকরন করা হয়েছে 'বৈতালিক'। এই গন আন্দোলনের ভাবাদর্শকে পৌছে দিয়েছেন দিক থেকে দিগন্তে।

সহায়ক গ্রন্থ পঞ্জি

১) কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় - সরোজ দত্ত
২) বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা - শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩) মধ্যাহ্নে থেকে সায়াহ্নে - অরুন মুখোপাধ্যায়
৪) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী (১য়,২য় খণ্ড)